অন্তর্গত কষ্ট

দর্পণ কবীর

ইমরানার সঙ্গে প্রথম পরিচয় এক বিয়ে বাড়িতে। হিরণ ওর দুর সম্পর্কের ফুপুর বিয়েতে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। আত্মীয়তার সূত্রে ঐ বিয়েতে এসেছিল ইমরানা। বিয়ে বাড়িতে ইমরানা খুব অল্প সময়ের মধ্যে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। ওর অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বিয়ে বাড়ির সকল যুবকরা। ছেলেরা পাল্লা দিয়ে ইমরানার পেছনে ছায়ার মত লেগেছিল। অনেকটা সম্মোহনের মত। শুধু হিরণ একটা দূরত্ব তৈরি করে রেখেছিল। ইমরানার চঞ্চলতায় মুখর হয়ে ওঠে বিয়ে বাড়ি। শহর থেকে আসা পরীর মত কিশোরী মেয়েটি সবার সাথে ভাব জমিয়ে হল্লা করে মাতিয়ে তোলে বিয়ে বাড়ির আনুসাঙ্গিক অনুষ্ঠান। গায়ে হলুদ থেকে কনেকে বর পক্ষের কাছে তুলে দেয়া পর্যন্ত ওর ছিল সরব অংশগ্রহণ। হিরণ লক্ষ্য করেছে, ইমরানার দিকে তাকালে চট করে চোখ ফেরানো যায়না এবং ওর উপস্থিতিকে উপেক্ষাও করা যায় না। যেমন ওকে উপেক্ষা করতে পারেনি হিরণ। গায়ে হলুদের দিনে, মধ্যরাতে ইমরানার আর্ত চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল অনেকের। হিরণ তখনো ঘুমায়নি। হৈ-চৈ শুনে ও এগিয়ে গেল। ও দেখতে পেল ইমরানা ঠোঁট ফুলিয়ে বাচ্চা মেয়ের মত কাঁদছে। ওর মুখমন্ডল জুড়ে কালির আঁচড়। হিরণের কানে কানে একজন ফিস ফিস করে বললো,
'ও যখন ঘুমিয়ে ছিল, তখন কে বা কারা ওর মুখে কালি মেখে দিয়েছে! হি-হি-হি!'
ইমরানাকে ঘিরে একটা সোরগোল হচ্ছে। কেউ কেউ ঠাট্টা-তামাশা করছেন। ইমরানা কান্না থামিয়ে হিরণের সামনে এসে বললো,
'আমার সঙ্গে একটু যাবেন?'
বিব্রত কণ্ঠে হিরণ বললো,
'কোথায়?'
'নদীর পাড়ে। নদীর জলে মুখ ধোব।'
'এতো রাতে নদীর পাড়ে যাবেন! কলের পানিতেই তো মুখ ধুয়ে নিতে পারেন।'
'আপনার সাজেশন চাইনি। আমি নদীতেই যাবো। নিয়ে চলুন।'
যেন আদেশ করলো। হিরণও কেমন সম্মোহিত হয়ে যায়। ও বললো,
'চলুন।'
ওরা অনেকগুলো চোখের নানা ভাষাকে উপেক্ষা করে নদীর দিকে হাঁটতে লাগলো। মধ্যরাতের বিয়ে বাড়ির মিইয়ে যাওয়া কোলাহল ওদের পেছনে হারিয়ে গেল এক সময়। নদীর পাড়ে এলেও নদীর জলে নামার সাহস পেল না ইমরানা। ও বললো,
'নদীর পানি দিয়ে আপনি আমার মুখ ধুয়ে দিন, প্লিজ!'
এ ধরনের আবদারের জন্য প্রস্তুত ছিল না হিরণ। এক ধরনের শীতল ভয় আর অন্য রকম ভালো লাগার স্রোত ওর অনুভূতিতে বইতে লাগলো। ও দাঁড়িয়েই থাকে। ইমরানা তাগিদ দিয়ে বলে,
'কলা গাছের মত দাঁড়িয়ে রইলেন যে! এই মধ্যরাতে আমি কি নদীর জলে নামতে পারি? তা ছাড়া আমি সাঁতার জানিনা।'
'বলছিলাম কী, আমি আপনার মুখ ধুয়ে দেব!'
'কেন ইচ্ছে করছে না? আমার মুখটি কি খুউব খারাপ?'
'তা নয়। বরং..।'
'বলুন, থামলেন কেন?'

হিরণ বুঝতে পারছে ও একটা গোলক ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছে। এই ধাঁধায় ও পড়তে চায় না। কিন্তু ও যেন পা হড়কে সেদিকেই পড়ে যাচ্ছে । ও নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে। ইমরানা হঠাৎ খিলখিল করে হাসিতে ফেটে পড়ে। ওর হাসির সামনে হিরণ কেমন বিব্রতবোধ করতে থাকে। ইমরানা বললো,
'আপনি দেখছি একটা ভীতুর ডিম! আমার মুখটা ধুয়ে দিতে এতো ভয় পাচ্ছেন! আপনি জানেন, অন্য যে কোন ছেলেকে এ কথাটি বললে প্রথমে খুশিতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতো!'
ওর এ কথাটি সঠিক বলেই মনে হয় হিরণের। কিন্তু ও যে সে রকম নয়, তা কী করে ওকে বোঝাবে?
ইমরানা বলে,
'ঠিক আছে, আপনি দু' হাতের অঞ্জলীতে নদীর জল আমাকে তুলে দিন, আমি মুখ ধুয়ে নিচ্ছি।'
হিরণ আর কথা বাড়ায় না। ও দু'হাতের অঞ্জলীতে নদীর জল তুলে আনলো। ইমরানা চোখ বুঝে রইলো। যেন ওর মুখ ধুয়ে দেবার জন্য অপ্রকাশিত আহবান। হিরণ বুকের সবটুকু সাহস এক করে কাঁপা হাতে ধুয়ে দিল ইমরানার মুখ। ওদের স্পর্শ বার্তা পৌঁছে দিল কোথাও। হিরণের একুশ বছরের জীবনটা এই প্রথম দুলে উঠলো অপ্রার্থিব আবিষ্টতায়। ইমরানার ভেতরেও কী, কোন ভাঙন হচ্ছে? ভাবে হিরণ। ফেরার পথে ইমরানা বললো,
'কই, পারলেন আমাকে উপেক্ষা করতে? শেষ পর্যন্ড়তো আমাকে স্পর্শও করলেন!'
ইমরানার কথা বুঝতে না পেরে হিরণ বললো,
'আমি ঠিক আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'
ইমরানা হেসে উঠলো। বললো,
'আমাকে কেউ উপেক্ষা করলে, আমি তা সহ্য করতে পারি না। এই বিয়ে বাড়ির সব ছেলেরা আমার পেছনে ঘুরেছে। শুধু আপনি ছিলেন নির্বিকার। আমার প্রতি আপনার নির্লুপ্ত ভাব দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। তাই, আপনার সন্ন্যাসী চরিত্রের অহংকার ভেঙ্গে দিলাম। হা-হা-হা।'
অবাক চোখে হিরণ তাকিয়ে রইলো ইমরানার দিকে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে ওকে রহস্যময়ী অপ্সরীর মতো লাগছে!

২

ইমরানার সাথে আর কখনো দেখা হবে ভাবেনি হিরণ। কিন্তু ওর সাথে দেখা হোক এটা মনে মনে কামনা করতো। কিন্তু দেখা হবার সম্ভবনা নেই। ইমরানা থাকে শীতলক্ষ্যা নদীর ঐ পাড়ে, ছোট্ট এক শহরে। হিরণদের বাড়ি নদীর অপর পাড়ে, শহরের প্রান্তিক পয়েন্টে। দুর সম্পর্কের আত্মীয়তার সূত্র ধরে ইমরানাদের বাড়ি যাওয়া যায়, কিন্তু সেটা ঠিক হবে কিনা এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিল না হিরণ। তারপরও একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ইমরানার সাথে। হিরণ কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিল এক বন্ধুর সাথে। পথের মাঝে এসে ওর বন্ধু রিকশা থেকে নামতেই ইমরানার মিষ্টি ডাক হিরণের কানে ভেসে এলো। ও হচকিয়ে গেল। বুকের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে উঠলো। ও চারপাশে এক ঝলক তাকিয়ে নিল। ও দেখতে পেল যেখানে ওর রিকশা থেমেছে, সেখানের সামনে একটা অট্টালিকার ছাদে ইমরানা দাঁড়িয়ে আছে। ছাদ থেকে ইমরানা ফের ডাকলো,
'এই যে শুনুন, গেট দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ুন।'
হিরণ চেষ্টা করেও নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। ও রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে অট্টালিকার গেট দিয়ে ঢুকে পড়লো। ইমরানা ছাদ থেকে দৌড়ে নেমে এলো নিচে। ওর চোখে মুখে খুশির ঝিলিক। হিরণ বললো,
'এটা আপনাদের বাড়ি?'
'না, এটা আমার নানার বাড়ি। আপনি আমাদের বাড়ি চেনেন না!'
'না। তবে ইচ্ছে করলে আপনাদের বাড়ির ঠিকানা জেনে নিতে পারবো। তা আপনি নানীর বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন?'
'না, আপনাকে খুঁজতে এসেছি।'
বলেই ও হাসতে লাগলো। এরপর বললো,

‘আমি প্রায়ই নানার বাড়িতে আসি। ছাদে দাঁড়িয়ে থেকে মাঝেমাঝে ভাবি, আপনি এই পথ দিয়ে যখন বাড়ি ফিরবেন, দেখা হবে। আজ দেখা হলো।’
হিরণ এর জবাবে কী বলবে, ভেবে পায় না। ওর কথাটি সত্য কিনা, কে জানে! হিরণ বলে,
‘এই বাড়িতে আজ কে কে আছেন। আমাকে ডেকে আনলেন, ভয় করছে না?’
এ কথায় হেসে ওঠে ইমরানা। ও বললো,
‘বাড়িতে শুধু ছোট মামা আছেন। সবাই গিয়েছেন মামার বউ দেখতে। আমি যাইনি। মনে হচ্ছে, আপনার সাথে দেখা হবে বলেই যাইনি। চলুন বাড়ির ভেতরে যাই।’
হিরণ আপত্তি জানালেও ইমরানা ওকে টেনে ড্রয়িং রুমে নিয়ে যায়। হিরণের অজানা ভয় বাড়তে থাকে। ইমরানা রান্না ঘরে গিয়ে কাজের বুয়াকে চা-নাস্তা দেবার কথা বলে ড্রয়িং রুমে ফিরে আসে। হিরণ ভয় ও ভালো লাগার বোধে জড়িয়ে থাকে। ইমরানা বলে,
‘আপনি আমার কোন খোঁজ নেননি! আমাকে দেখার আপনার ইচ্ছে করেনি?’
হিরণ মনে মনে বললো ‘প্রতিনিয়ত ইচ্ছে করেছে।’ মুখে বললো,
‘আপনার খোঁজ নেব কেন? কিসের প্রয়োজনে?’
‘কোন প্রয়োজন নেই!’
‘আসলে প্রয়োজন আছে কী, নেই-তা ভাবিনি।’
‘আপনার অনেক অহংকার, না?’
‘না। তা নয়। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আসলে আমি একজন সাধারণ ছেলে। দরিদ্র পরিবারের সন্তান। আমার প্রয়োজনটা প্রথমে ভাত-কাপড়ের। তারপর লেখাপড়ার উপকরণ। ও সব জোগাতেই দিন ফুরিয়ে যায়।’
‘তারপরও আপনি স্বপ্ন দেখেন না?’
‘স্বপ্ন দেখার চেয়ে স্বপ্ন সাজিয়ে রাখি বেশি।’
‘কাউকে ভালো লাগে না? কাউকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে না?’
‘ভালোবাসার চাইতে, ভালোবাসা হারিয়ে যাওয়ার ভয় আমাদের বেশি। পেয়ে হারানোর চেয়ে, না পাওয়াই ভালো নয় কি?’
এ কথায় ইমরানা বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে থাকে হিরণের দিকে। ও একটু সময় নিয়ে বলে,
‘তার মানে আপনি স্বপ্ন সত্যি করার প্রতিশ্রুতি চাচ্ছেন? ভালোবাসা পাবার নিশ্চয়তা চাচ্ছেন?
‘আমার কোন কিছু চাওয়ার সাহস একেবারেই কম।’
‘কিন্তু আমি আজ আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।’
‘বলুন।’
‘আপনাকে আমার ভালো লাগে। আমরা কী..!’
‘আর বলবেন না, প্লিজ! আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে!’
হিরণের আর্তি উপেক্ষা করে ও বলে,
‘আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি, হিরণ!’
ইমরানার এ কথা শেষ হতেই ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করলো ওর মামা। তিনি হিরণকে দেখে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ইমরানা ভড়কে যাওয়া গলায় মামার উদ্দেশ্যে তাড়তাড়ি বললো,
‘মামা, ও হচ্ছে হিরণ। ও চমৎকার কবিতা লেখে। ও..!’
‘ইমরানা, তুমি আমার জন্য এক কাপ কফি তৈরি করে নিয়ে আসো তো, মা! আমি ওর সাথে কথা বলছি।’
ইমরানা চলে গেল। যাবার সময় ও আকুতি ভরা চোখে এক ঝলক তাকালো হিরণের শুকনো মুখের দিকে। ইমরানা চলে যেতেই ওর মামা চাপা গলায় হিরণের উদ্দেশ্যে বললেন,
‘তুমি এখুনি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। যদি কখনো ইমরানার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করো, তবে এর পরিণাম হবে ভয়াবহ! মনে রেখো, তুমি নিতান্তই গরীবের সন্তান। ইমরানা তোমার জন্য আকাশের চাঁদ! চাঁদ ধরার দুঃসাহস দেখিয়ো না!’

হিরণ আর বসেনি। ও হনহন করে বেরিয়ে আসে ঐ অট্টালিকা থেকে। ওর কানে বারবার ইমরানার মামার কথাগুলো বাজতে থাকে। এক ধরনের গ্লানি এবং কষ্টে ও ডুবে যায়।

৩

ভয়, সংকোচ ও দ্বিধার অদৃশ্য দেয়াল ভাঙতে পারেনি হিরণ। অথচ নিজের ভেতরে রক্তক্ষরণ! চার বছর পর দেয়ালটাকে তুচ্ছ মনে হলো ওর। এই চার বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে। বদলেছে ও নিজেও। মার্ষ্টাস পরীক্ষা দেবার পর থেকেই ওর ভেতরে কেমন সাহস বাড়তে থাকে। ইমরানার মামার কথা অর্থহীন হয়ে যায়। এই চার বছরে ও ইমরানার সাথে কোন যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি। নানার বাড়িতে হিরণের দেখা হবার তিনমাস পর ইমরানা ওকে একটা চিঠি লিখেছিল। চিঠিতে ও লিখেছিল,

'হিরণ,

সেদিন তুমি ভীতুর মত পালিয়ে গেলে। আমি ভেবেছিলাম তুমি পরে আমার সাথে যোগাযোগ করবে এবং তোমার জবাবটা আমাকে জানাবে। আমি আমার কথা অকপটে তোমাকে জানিয়েছি। কিন্তু তোমার কথা আমার জানা হয়নি। প্লীজ, তোমার কথা আমাকে জানাও। যদি না জানাও, তবে ধরে নেব, আমাকে হারিয়ে দিতে এ তোমার এক ধরনের অহংকার। কোনটি বড় ভালোবাসা নাকি অহংকার?

ইমরানা'।

ইমরানার চিঠিটি এখনো যত্ন করে রেখে দিয়েছে হিরণ। এই পত্র ওর ব্যক্তিগত জীবনের সবচেয়ে মূলবান সম্পদ। এ যেন পুষে রাখা একতাল অন্তর্গত কষ্ট। ইমরানার কথা মনে পড়লেই ও এই পত্রটি পড়ে। ইমরানাকে ওর জবাবটি না জানালেও হিরণ ওর খোঁজ রাখতো। মাঝেমাঝে ও ইমরানার কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দূর থেকে ওকে দেখে আসতো। নীরবে দেখার মধ্য দিয়েই ওর অপ্রকাশিত ভালোবাসার দ্বীপশিখাটি জ্বলে ছিল। আজ প্রায় চার বছর পর ও অদৃশ্য দেয়ালটা ভেঙে ফেললো। আজ কেন জানি, ইমরানাকে দেখতে ওর খুব ইচ্ছে করছে। না বলা কথাটি বলতে চাইছে মন। ওর মন এতোটা বেপরোয়া কখনো হয়নি। হিরণ সব ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে ছুটে চললো ইমরানাদের বাড়ির দিকে। চার বছর আগে যে জবাবটা ইমরানাকে জানাতে পারেনি, আজ তা বলে ফেলে ও হাল্কা হতে চায়।

ইমরানাদের বাড়ি খুঁজে পেত কোন কষ্ট হলো না হিরণের। ইমরানার দাদার নাম ওদের এলাকার সবাই জানে। শীতলক্ষ্যা নদী পার হয়ে রিকশাওয়ালাকে 'হক সাহেবের বাড়ি যাবো' বলতেই রিকশাওয়ালা কোন উচ্চবাচ্য না করে ছুটে চললো। শহর, শহরতলী বা গ্রামে যে কোন ধনী বা সম্ভ্রান্ত পরিবারকে সাধারণ সকলেই চেনে। ইমরানার দাদা হক সাহেব তেমন একজন ব্যক্তি। রিকশাওয়ালা হক সাহেবের বাড়ির গেটের সামনে নামিয়ে দিল। হিরণ দেখলো হক সাহেবের বাড়িতে বিয়ের আয়োজন চলছে। বাড়ির প্রবেশ মুখে বিয়ে বাড়ির বিশাল গেট। দালান জুড়ে আলোক সজ্জা। মানুষজন ছুটোছুটি করছে বাড়ির সামনে। বাড়ির ভেতর থেকে আসছে হৈ-হল্লার শব্দ। হিরণের হার্টবিট যেন বেড়ে যাচ্ছে। ও একজন পথচারীকে থামিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললো,

'এই যে শুনুন, এটা কি হক সাহেবের বাড়ি?'

পথচারী মুখে লম্বা হাসি টেনে বললেন,

'জে, হ। এইটা হক সাহেবেরই বাড়ি। আপনি কার কাছে আইছেন?'

এর জবাব না দিয়ে ও বললো,

'এই বাড়িতে আজ কার বিয়ে হচ্ছে, বলতে পারেন?'

'আইজ হক সাহেবের নাতনী ইমরানার বিয়া হইতাছে।'

'ইমরানা বিয়ে!'

'হ। ছেলে আমেরিকায় থাকে, ইঞ্জিনিয়ার!'

এ কথা বলেই পথচারী চলে গেল। ও হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো বিয়ে বাড়ির সামনে। কতক্ষণ ও দাঁড়িয়ে ছিল, কে জানে! একসময় উদভ্রান্তের মতো হাঁটতে লাগলো হিরণ।